অধ্যায় - ২৩

যোগ ও পেঁয়াজ, শামার সর্পদংশন থেকে আরোগ্যলাভ, বিসুচিকা (কলেরা) নিবারণার্থে নিয়মের উল্লংঘন, গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা।

প্রস্তাবনা ঃ-

বস্তুতঃ মানুষ ত্রিগুণময় (তিন গুণ অর্থাৎ সত্ব-রজ-তম) এবং মায়ার প্রভাবে তার এই ধরনের ধারণা হয় যে 'আমি শরীর বা দেহ'। দৈহিক বুদ্ধির আবরণে এইরূপ ধারণা হয় যে, 'আমি কর্তা ও ভোগী'। এইভাবে মানুষ অনেক রকম কষ্টে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তারপর আর মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না। **মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে গুরুর শ্রীচরণে অটল প্রেম ও ভক্তি।** মহানায়ক ভগবান সাই ভক্তদের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করে নিজ স্বরূপের তাদের রূপান্তরিত করেছিলেন। **উক্ত কারণে আমরা শ্রী সাইবাবাকে ঈশ্বরেরই অবতার মানি।** কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন যে- "আমি তো ঈশ্বরের এক দাস।" ঈশ্বর-অবতার হওয়া সত্ত্বেও মানুষদের কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং নিজের বর্ণের কর্তব্যগুলি কিভাবে পালন করা উচিত, তারই উদাহারণ তিনি লোকেদের সামনে প্রস্তুত করেন। তিনি কারো সাথে কোন রকমের স্পর্ধা করেননি আর কারো কোন ক্ষতিও করেননি। যিনি সব জড় ও চেতন পদার্থে ঈশ্বরকেই দর্শন করতেন, তাঁর পক্ষে বিনম্র হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি কাউকে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করেন নি, সদাই বলতেন- "আমি ঈশ্বরের এক দাস।" **"অল্লাহ মালিক", এটিই সর্বক্ষণ উচ্চারন করতেন।** আমরা অন্যান্য সন্তদের সাথে পরিচিত নই আর এও জানি না যে তাঁরা কি রূপ আচরণ করতেন অথবা তাঁদের দিনচর্যা ইত্যাদি কি ছিল? ঈশ্বর কৃপায় শুধু এতটাই জানি যে, তাঁরা অজ্ঞান ও বদ্ধ জীবদের জন্য অবতীর্ণ হন। **শুভ কর্মের ফলস্বরূপই আমাদের সন্ত কথা এবং লীলা শ্রবণ করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাছাড়া নয়।** এবার আমরা মুখ্য কাহিনীর দিকে আসি।

যোগ এবং পেঁয়াজ ঃ-

একবার একজন যোগাভ্যাসী নানাসাহেব চাঁদেরকরের সাথে শিরডী আসেন। উনি পাতঞ্জলি যোগসূত্র ও যোগশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন,

কিন্তু ব্যবহারিক অনুভব হতে বঞ্চিত ছিলেন। মন একাগ্র না হওয়ার দরুণ অল্পক্ষণের জন্যও ধ্যানের মাধ্যমে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারতেন না। যদি বাবার কৃপা হয়, তাহলে তাঁর কাছে দীর্ঘ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির বিধি জানা যেতে পারে, এই ধারণা নিয়ে উনি শিরডী আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে দেখেন যে, বাবা রুটি আর পেঁয়াজ খাচ্ছেন। এই দেখে ওঁর মনে হয় যে, বাসি রুটি আর কাঁচা পেঁয়াজ খান যিনি, এমন ব্যক্তি আমার সমস্যা কি ভাবে দূর করবে?" বাবা অন্তর্জ্ঞান দিয়ে ওঁর মনের কথা জেনে তক্ষুনি নানাসাহেবকে বলেন- "ও নানা, যার পেঁয়াজ হজম করার শক্তি আছে, তাকেই সেটা খাওয়া উচিত, অন্যদের নয়।" এই শব্দগুলি শুনে যোগী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বাবার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শুদ্ধ ও নিষ্কপট ভাবে নিজের সমস্যাগুলি বাবার সামনে রেখে তাদের সমাধান প্রাপ্ত করেন। এই ভাবে সন্তুষ্ট ও সুখী হয়ে বাবার দর্শন করে ও উদী নিয়ে তিনি শিরডী থেকে প্রস্থান করেন।

সর্পদংশন থেকে শামার আরোগ্যলাভ ঃ-

কাহিনীটি শুরু করার আগে হেমাডপন্ত লিখছেন যে, জীবের তুলনা পোষা টিয়া পাখীর সাথে করা যায়। কারণ দুজনই বদ্ধ। একজন শরীরে তো অন্যজন খাঁচায়। দুজনেই নিজের বদ্ধ অবস্থাকে উত্তম মনে করে। কিন্তু হরিকৃপায় যদি তারা কোন খাঁটি গুরুর শরণাপন্ন হতে পারে তাহলে তিনি তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে বন্ধনমুক্ত করে দেন। তখন তাদের জীবনের স্তর অনেক উঁচু হয়ে যায়, যার তুলনায় আগের সংকীর্ণ অবস্থা একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়।

গত অধ্যায়ে শ্রী মিরিকরের উপর আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে কি ভাবে বাবা তাঁকে বাঁচিয়ে নেন - সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এবার ঐ রকমেরই আরেকটি কথা শ্রবণ করুন। একবার শামাকে একটা বিষধর সাপ কামড়ে দেয়। সমস্ত শরীরে বিষ প্রসারিত হওয়ার দরুণ উনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং আর্তনাদ করে বলছিলেন- "আমি আর বাঁচব না।" ওঁর বন্ধুরা ওঁকে ভগবান বিঠোবার মন্দিরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। এই ধরনের রোগীদের প্রায় সেখানেই নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু শামা মস্‌জিদের দিকে দৌড়ন, নিজের বিঠোবা শ্রী সাইবাবার কাছে। বাবা ওঁকে দূর থেকে দেখে অপশব্দ বলতে শুরু করেন। প্রচণ্ড রাগে বলতে লাগলেন- "যা, দূর হ', নীচে নাম।" শ্রী সাইবাবাকে এইরূপ রাগ করতে দেখে শামা অত্যন্ত বিপদে পড়ে যান এবং নিরাশ মনে ভাবেন- "কেবল মস্‌জিদই ত আমার বাড়ী এবং বাবা অসহায়ের আশ্রয়দাতা। যখন তিনিই আমাকে এখান থেকে এই ভাবে তাড়াচ্ছেন, তখন আর

আমি কার শরণে যাই?" উনি নিজের জীবনের আশা ছেড়ে ওখানেই শান্ত হয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ যখন শান্ত হয়, তখন শামা উপরে উঠে বাবার কাছে গিয়ে বসেন। তখন বাবা বলেন- "ভয় পেও না, বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না। দয়ালু ফকির তোমার রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। বাড়ী গিয়ে শান্ত হয়ে বসো এবং বাইরে বেরিও না। আমার উপর ভরসা রেখে নির্ভয় হয়ে চিন্তা ছেড়ে দাও।" ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে, তাত্য়া ও কাকাসাহেব দীক্ষিতকে দিয়ে বলে পাঠান- ও যা ইচ্ছে হয় খাক, কিন্তু শোয়ে না যেন।" বলা বাহুল্য, এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শামা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই বিষয়ে কেবল এতটাই মনে রাখার যোগ্য যে, বাবা শব্দগুলি (পঞ্চক্ষরীয়, যা দূর হ', নীচে নাম) শামাকে লক্ষ্য করে বলেননি। এই আদেশটা দেন সাপটা ও তার বিষকে (অর্থাৎ শামার শরীরে বিষ না ছড়ায়, সেই আজ্ঞাই দিচ্ছিলেন)। অন্যান্য মন্ত্রশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতো মন্ত্র বা মন্ত্রোক্ত চাল বা জল ইত্যাদি ব্যবহার করেননি।

এই ঘটনাটি এবং এই ধরনের ঘটনা শুনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় যে, যদি মায়াযুক্ত সংসার পার করতে চাও তাহলে হৃদয়ে শুধু সাইচরণ ধ্যান করো।

বিসূচিকা মহামারী ঃ-

একবার শিরডী বিসূচিকার প্রকোপে কেঁপে ওঠে ও গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ওঠে। ওরা অন্য গ্রামের লোকেদের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ বন্ধ করে দিল। গ্রামের পঞ্চায়েৎ দুটো আদেশ জারী করে। প্রথম - কাঠ বোঝাই করা কোন গাড়ী গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়- কেউ ছাগল বলি দেবে না। এই আদেশ যে অমান্য করবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। বাবা ত জানতেনই যে এসব কেবল অন্ধ বিশ্বাস। তাই এই আদেশগুলির দিকে কান দেন না। আইন বলবৎ থাকাকালে একদিন এক জ্বালানী কাঠের গাড়ী গ্রামে ঢুকতে চাইল। সবাই জানত যে, গ্রামে কাঠের প্রচণ্ড অভাব ও প্রয়োজন। তবুও লোকেরা ঐ গাড়ীওয়ালাকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগল। বাবা এই কথাটা জানতে পেরে স্বয়ং সেখানে এসে গাড়ীওয়ালাকে গাড়ীটা মস্‌জিদে নিয়ে যেতে বলেন। বাবার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারল না। আসলে ধুনির জন্য তাঁর কাঠের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি গাড়ীর সমস্ত কাঠ কিনে নেন। একজন মহান অগ্নিহোত্রীর ন্যায় তিনি জীবন ভোর ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখেন এবং তাই কাঠ জোগাড় করে রাখতেন।

বাবার বাড়ী অর্থাৎ মস্‌জিদ সবার জন্য খোলা থাকত। তার জন্য কোন তালা-চাবির দরকার ছিল না। গ্রামের গরীব লোকেরা বাবার ভাণ্ডার থেকে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কাঠ বার করে নিয়েও যেত, কিন্তু বাবা তাতে কখনো কোন আপত্তি করেননি। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে ঈশ্বরেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত দেখতেন। তাই তাঁর মনে কারো প্রতি কোন ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব ছিল না। পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক সাধারণ গৃহস্থের উদাহরণ লোকেদের সামনে তুলে ধরেন।

গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা ঃ-

এবার দেখা যাক, দ্বিতীয় আদেশটির বাবা কিরূপ দুর্দশা করেন। ঐ সময় মস্‌জিদে কেউ একজন একটা পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য আনে। পাঁঠাটার মৃতপ্রায় অবস্থা। এই সময় মালেগাঁও এর ফকির, পীর মোহম্মদ অর্থাৎ 'বড়ে বাবা'ও বাবার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা ওকে পাঁঠাটা কেটে বলি দিতে বলেন। শ্রী সাইবাবা 'বড়ে বাবা'কে খুব সম্মান করতেন। তাই উনি সব সময় বাবার ডানদিকে বসতেন। সবার আগে বড়ে বাবা ছিলিম পান করতেন, তারপর বাবাকে দিতেন। তার পর ভক্তরা পেত। দুপুরে যখন খাবার বাড়া হতো, তখন বাবা 'বড়ে বাবা'কে আদর করে নিজের ডান দিকে বসাতেন এবং তখন বাকী সবাই খেতে শুরু করত। বাবার কাছে যতটা দক্ষিণা একত্রিত হতো তার থেকে তিনি রোজ ৫০ টাকা 'বড়ে বাবা'-কে দিতেন। যখন 'বড়ে বাবা' ফিরে যেতেন, বাবা ওঁকে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আসতেন। এত সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও যখন ওঁকে বাবা পাঁঠা কাটতে বলেন, তখন 'বড়ে বাবা' সোজাসুজি মানা করে দেন এবং স্পষ্ট শব্দে বলেন যে 'বলি দেওয়া ব্যর্থই হবে।' তখন বাবা শামাকে বলি দিতে বলেন। উনি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং সেটা বাবার সামনে রেখে দেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ কারণটা জানতে পেরে ছুরিটা ফেরত চেয়ে পাঠান। শামা তখন আরেকটা ছুরির খোঁজে বেরোন ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মস্‌জিদে ফেরেন না। এবার কাকাসাহেব দীক্ষিতের পালা। এই সোনা তো খাঁটি ছিল কিন্তু তার পরখ হয়াও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বাবা ওঁকে ছুরি এনে পাঁঠাটা কাটতে বলেন। কাকাসাহেব সাঠে 'ওয়াড়া' থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং বাবার আজ্ঞা পাওয়ামাত্র বলি দিতে প্রস্তুত হন। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হওয়ায় কাকাসাহেব জীবনে বলিকৃত্য জানতেন না। যদিও হিংসাবৃত্তি নিন্দনীয় তবুও উনি পাঁঠা কাটতে প্রস্তুত ছিলেন। সবাই আশ্চর্য্য হয় যে, 'বড়ে বাবা' মুসলমান হয়েও বলি দিতে রাজী হলেন না আর ইনি সনাতন ব্রাহ্মণ হয়ে বলি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এদিকে কাকাসাহেব

ধুতি উপরে করে, ছুরি নিয়ে, হাত উপরে উঠিয়ে বাবার অন্তিম আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। বাবা বলেন- "আর কি ভাবছ? ঠিক আছে, মারো।" কাকাসাহেব যেই কোপটা বসাতে যাবেন, এমন সময়বাবা বললেন- "দাঁড়াও, তুমি কত দুষ্ট হে! ব্রাহ্মণ হয়ে পাঁঠা বলি দিচ্ছ?" কাকাসাহেব ছুরিটা নীচে রেখে বাবাকে বলেন- "আপনার আদেশই আমাদের জন্য সর্বস্ব, আমরা অন্য আইন কি জানি? আমরা তো সর্বদা আপনার কথাই স্মরণ করি এবং দিন-রাত আপনারই আজ্ঞা পালন করি। এই বিচার করে কি লাভ যে পাঁঠা মারা উচিত না অনুচিত। আর নাই আমরা তার কারণ জানতে ইচ্ছুক। গুরুর আজ্ঞা নিঃসংকোচে ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই আমাদের কর্তব্য ও ধর্ম।" তখন বাবা কাকাসাহেবকে বলেন- "আমি নিজেই বলি দেওয়ার কাজটি করব।" তখন এই স্থির হয় যে একটু দূরে (যেখানে অনেকগুলি ফকির বসেছিল) গিয়ে বলি দেওয়া হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই পাঁঠাটা মারা যায়।

ভক্তদের শ্রেণীর বর্ণনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। ভক্ত তিন ধরনের হয় - ১) উত্তম ২) মধ্যম ৩) সাধারণ। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা হয়, যাঁরা নিজের গুরুর ইচ্ছে আগে থেকেই বুঝে, সেটা কর্তব্য জেনে আদেশের অপেক্ষা না করে সেবা করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আজ্ঞা পেয়েই তক্ষুনি সেটি পালন করেন। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আজ্ঞা পালন করতে সব সময় বিলম্ব করেন এবং পদে-পদে ভুল করেন। ভক্তরা যদি নিজেদের বুদ্ধি জাগ্রত ও ধৈর্য্য ধারণ করে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বেশী দূরে থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, হঠযোগ বা অন্য কঠিন সাধনার কোন দরকার হয় না। শিষ্যর মধ্যে যখন উক্ত গুণগুলির বিকাশ হয় এবং পরবর্ত্তী উপদেশের জন্য ভূমিকা তৈরী হয়ে যায়, তখন গুরু স্বয়ং প্রকট হয়ে তাকে পূর্ণতার (আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা) দিকে নিয়ে যান। পরের অধ্যায়ে বাবার মনোরঞ্জক হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।